পঞ্চম অধ্যায়

জীবনাদর্শ

প্রিয় শিক্ষার্থী, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সহ কয়েকজন নবি-রাসুল এবং মুসলিম মনীষীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছো। নিশ্চয়ই তাঁদের জীবনাদর্শগুলো তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে তোমাদের নৈতিক মূল্যবোধ দৃঢ় করেছো।

৮ম শ্রেণির এই অধ্যায়ে তুমি আরো কয়েকজন নবি-রাসুল এবং মুসলিম মনীষীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবে।

বাড়ির কাজ

'আমার প্রিয় ব্যক্তির যেসব গুণ আমি অনুসরণ করি'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তোমার পছন্দের ব্যক্তির গুণাবলি তুমি যেভাবে অনুসরণ করো তা লিখে আনবে। প্রিয় ব্যক্তিত্ব হতে পারে শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্য/প্রতিবেশি/সহপাঠী/শিক্ষক প্রমুখ।)

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)
(হিজরত থেকে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত)

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.) -এর জন্ম, নবুওয়াত, কাফির-মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতন-প্রতিরোধ উপেক্ষা করে মক্কায় ইসলাম প্রচার, আল্লাহর দিদারে মি'রাজ গমন এবং মদিনায় হিজরত পর্যন্ত জীবনচরিত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি। এ শ্রেণিতে তোমাদেরকে হিজরত পরবর্তী প্রিয়নবি (সা.)-এর ইসলাম প্রচার, মদিনা রাষ্ট্র গঠন, বদর, উহুদ, খন্দক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুদ্ধনীতি এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি ও এর তাৎপর্যসহ আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে জানবো।

মদিনায় হিজরত

৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবি (সা.) জন্মভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.) হিজরতের সঙ্গী ছিলেন। মদিনায় যাত্রা পথে তাঁরা সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। ঘটনাচক্রে কাফিরদের একটি দল সাওর পাহাড়ের নিকটে এসে উপস্থিত হয়। হযরত আবু বকর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন নবি করিম (সা.) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন–

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ

অর্থ: তুমি চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। (সূরা আত-তওবা, আয়াত: ৪০)

পর্বতের গুহায় তাঁরা তিনদিন অবস্থান করেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা.) তাঁদের জন্য গোপনে খাবার পৌঁছে দিতেন। এখানে ৩দিন অবস্থানের পর ৪র্থ দিনে তাঁরা লোহিত সাগরের অপরিচিত পথ ধরে ইয়াসরিবের দিকে যাত্রা করেন। ছয় দিনের অবিরাম যাত্রার পর ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার তিনি ইয়াসরিবের কয়েক মাইল দূরে কুবা নামক স্থানে পৌঁছেন। এখানে চার দিন থাকার পর ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার মহানবি (সা.) মদিনায় (ইয়াসরিব) পৌঁছেন। ইসলামের ইতিহাসে মহানবি (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় গমনকেই হিজরত বলা হয়। মহানবি (সা.)-এর আগমনে খুশি হয়ে ইয়াসরিববাসী এর নতুন নাম রাখেন মদিনাতুন্নবি বা নবির শহর।

মদিনায় হিজরতের গুরুত্ব

মহানবি (সা.) -এর মদিনায় হিজরত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ফলে ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়। মুসলমানদের কষ্টের জীবনের অবসান ঘটে। ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশেপাশের অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। অল্প দিনের মধ্যেই মহানবি (সা.) মদিনার আউস, খাযরাজ, বনু নাযির, বনু কায়নুকা ও তাদের বন্ধু গোত্রসমূহ নিয়ে একটি ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হন। সকল গোত্র ও সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতি গঠন করেন। ফলে মদিনাবাসী নিজেদের কলহ-বিবাদ ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে মহানবি (সা.) সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হন।

মদিনা সনদ

মদিনায় এসে মহানবি (সা.) একটি আদর্শ জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তিনি আরবদের চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলে দেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করেন। তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন এবং সকলকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি একটি কল্যাণকর সমৃদ্ধ জাতি গঠন ও সর্বধর্মীয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য মদিনা ও আশেপাশের অঞ্চলসমূহের মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর করেন। পৃথিবীর

ইতিহাসে এটা মদিনা সনদ (The Charter of Medina) নামে পরিচিত। এ সনদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারা নিম্নরূপ:

মদিনা সনদ

১. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, এটা মহানবি মুহাম্মাদ (সা.) -এর পক্ষ থেকে লিখিত অঙ্গীকারনামা।

২. মদিনার পৌত্তলিক, ইহুদি এবং মুসলমান সবাই মিলে এক জাতি (উম্মাত)।

৩. মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

৪. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে মদিনার সকল সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে সে আক্রমণকে প্রতিহত করবে।

৫. দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা ও সাহায্য করতে হবে।

৬. এখন হতে মদিনায় রক্তপাত, হত্যা ও রাহাজানি নিষিদ্ধ করা হলো।

৭. স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হবে। সেজন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।

৮. কেউ কুরাইশদের সাথে কোনো প্রকার গোপন সন্ধি করতে পারবে না; কিংবা মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করতে পারবে না।

৯. চুক্তিপত্রের পক্ষগুলোর বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করলে পক্ষগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা প্রতিহত করবে এবং পক্ষগুলো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ও কল্যাণকামিতা বজায় রাখবে।

১০. চুক্তির পক্ষগুলোর জন্য ইয়াসরিব একটি সংরক্ষিত ও পবিত্র নগরী হিসেবে বিবেচিত হবে।

১১. ইয়াসরিবকে কেউ আক্রমণ করলে চুক্তির সকল পক্ষ পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে তা প্রতিহত করবে।

১২. প্রতিবেশীকে নিজের মতোই গণ্য করতে হবে। তার কোনো ক্ষতি বা তার প্রতি কোনো অপরাধ করা যাবে না।

১৩. কোনো বিষয়ে যখনই মতানৈক্য হবে, তখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

১৪. অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে, ভঙ্গ করা যাবে না।

মদিনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মদিনা সনদ মহানবি (সা.) -এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। এই সনদে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে মদিনাবাসী একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয় এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মহানবি (সা.) মদিনা পুনর্গঠনের সুযোগ পান। ফলশ্রুতিতে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

এই সনদ মদিনার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নাগরিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এর ফলে শতধাবিভক্ত আরবদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। অনেক আগে থেকে চলে আসা গৃহযুদ্ধ ও অনৈক্যের পরিবর্তে ইয়াসরিবে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম অমুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হয়। সর্বোপরি এই সনদের মাধ্যমে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামের সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, পরমতসহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলামের বিধানসমূহ প্রবর্তন

মহানবি (সা.)-এর মদিনা জীবনের শুরুটা ছিল ইসলামের বিধান প্রবর্তনের সময়। মদিনা জীবনের শুরুতেই ৬২২ খ্রিস্টাব্দে আজানের রীতি প্রবর্তিত হয়। ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মহান আল্লাহ বায়তুল মুকাদ্দাস -এর পরিবর্তে বায়তুল্লাহকে কেবলা নির্ধারণ করেন। একই বছরে মুসলমানদের জন্য রমযানের এক মাস সাওম পালনের বিধান প্রবর্তিত হয়। এ বছরেই মুসলমানদের প্রধান দু'টি ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদযাপন শুরু হয়। এছাড়াও এই বছরে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাতের বিধান নাযিল হয়।

বদর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের পটভূমি

মদিনায় হিজরতের পর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মান, মর্যাদা ও শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। মদিনার ধর্মীয় সহাবস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্বে মদিনার উন্নতি দেখে মক্কার কুরাইশরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা এবং মদিনার আশেপাশে লুটতরাজ শুরু করে। এসময় মদিনার মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবন উবাই-এর নেতৃত্বে একদল ইহুদি কুরাইশদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা মহানবি (সা.) ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার পরিকল্পনায় লিপ্ত থাকে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়ার সাথে কুরাইশদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করায় তারা মদিনাকে তাদের বাণিজ্য পথের হুমকি মনে করে। এ হুমকি দূর করতে তারা একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মহানবি (সা.) কুরাইশদের এসকল অপতৎপরতার গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে মক্কার উপকণ্ঠে একটি দল প্রেরণ করেন। তখন ছিল রজব মাস। রজব মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নাখলা নামক স্থানে কুরাইশদের একটি দলের সাথে জাহাশের নেতৃত্বাধীন দলের খণ্ডযুদ্ধ সংঘঠিত হয়।

এতে কুরাইশদের দলনেতা আমর বিন হাযরামী নিহত হয়। নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করায় মহানবি (সা.) আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশকে ভর্ৎসনা করেন। নাখলার এ ঘটনায় কুরাইশদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রতিশোধের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অবশেষে মদিনার মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা চূড়ান্ত রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে।

এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, সিরিয়া থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। গুজবের সত্যতা যাচাই না করেই কুরাইশরা আবু জেহেলের নেতৃত্বে ১০০০ (এক হাজার) সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের এ সংবাদ জানতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ ওহি পাঠিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দেন।

যুদ্ধের ঘটনা

মহানবি (সা.) মদিনার অদূরে বদর প্রান্তরে মুসলিম সৈন্য নিয়ে হাজির হন। তাঁর সঙ্গী হলেন ২৫৩ জন আনসার এবং ৬০জন মুহাজিরসহ মোট ৩১৩ জন সৈন্যের একটি দল। অপরপক্ষে মক্কার কাফিরদের ছিল ১০০০ (এক হাজার) সৈন্যের সুসজ্জিত দল। এর মধ্যে তিনশত অশ্বারোহী এবং সাতশত উষ্ট্রারোহী। মহানবি (সা.) যুদ্ধের শুরুতে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উপদেশ ও নির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় হিজরি ১৭ রমযান মোতাবেক ১৭ মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদর প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১০০০ জন সুসজ্জিত সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন ইমানি শক্তিতে বলিয়ান সৈন্য অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথমেই সম্মুখ যুদ্ধে কুরাইশদের নেতা উতবা, শায়বা ও ওয়ালিদ পরাজিত ও নিহত হয়। এরপর যুদ্ধের অল্পক্ষণের মধ্যেই মহান আল্লাহর সাহায্যে মুসলিম সৈন্যরা কুরাইশদের ওপর বিজয়ী হলেন। ৬ জন মুহাজির ও ৮জন আনসারসহ মোট ১৪ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। অপরপক্ষে ৭০ জন কাফির-মুশরিক নিহত হয় এবং সমসংখ্যক সৈন্য যুদ্ধবন্দী হয়।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে মহানুভবতা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বদরের যুদ্ধবন্দীদের সাথে সহানুভূতির মনোভাব পোষণের নির্দেশ দেন। ফলে মুসলিম সৈন্যরা যুদ্ধবন্দীদের সাথে উদার ও মানবিক আচরণ করেন। তাদের মধ্যকার বস্ত্রহীনদের বস্ত্র প্রদান করা হয়। তাঁদের খাদ্য প্রদান করা হয়। সবশেষে মুক্তিপণ নিয়ে আটক কুরাইশ সৈন্যদের মুক্ত করে দেওয়া হয়। কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে মুসলিম বালকদের শিক্ষাদানের বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়া হয়। এমনকি ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না এ মর্মে ওয়াদা প্রদানের মাধ্যমেও অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি এমন মহানুভবতা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

যুদ্ধের গুরুত্ব

বদরযুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এটি ছিল সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফয়সালাকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় হয়। মক্কার কাফির-মুশরিকদের দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। মদিনা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলামের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া এত

অল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্য বিপুলসংখ্যক অমুসলিম সৈন্যের বিপরীতে জয়ী হওয়ার ফলে তাঁদের মনোবল ও ইমানি শক্তি বৃদ্ধি পায়। চূড়ান্তভাবে কুরাইশদের ক্ষমতা ও শক্তি খর্ব হয় এবং মহানবি (সা.)-এর শক্তি ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

এছাড়া কুরাইশদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র-শস্ত্র, ঘোড়া, উট এবং অন্যসামগ্রী লাভের মাধ্যমে মুসলমানদের পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। মদিনা ও আশেপাশের ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিক ও ইহুদিদের উপর মুসলমানরা প্রভাব বিস্তার করে। সর্বোপরি আরবের বুকে ইসলাম এক অপরাজেয় শক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

উহুদের যুদ্ধ

উহুদের যুদ্ধের পটভূমি

বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি মক্কার কুরাইশরা ভুলতে পারেনি। তারা বদরের প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। এ সময় মক্কার কবিরা তাদের কবিতায় মদিনার বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। কুরাইশ নারীরা তাদের পুরুষদেরকে আরো একটি যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে কুরাইশরা বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আরেকটি যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

যুদ্ধের ঘটনা

তৃতীয় হিজরি সালে মক্কার কাফির-মুশরিকরা উমাইয়া নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০০০ (তিন হাজার) সৈন্য নিয়ে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। তারা মদিনার নিকটবর্তী উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করে। কুরাইশদের মদিনা অভিযানের সংবাদ পেয়ে মহানবি (সা.) ১০০০ (এক হাজার) সৈন্যর একটি দল প্রস্তুত করেন। পথিমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে ৩০০ সৈন্যসহ সরে দাঁড়ায়। ফলে মহানবি (সা.) মাত্র ৭০০জন সৈন্য নিয়ে কুরাইশদের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হন। ২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে উভয় দল সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের শুরুতে মুসলিম সৈন্যদের আক্রমণে কুরাইশরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় গিরিপথে পাহারারত মুসলিম সৈন্যদল এটিকে চূড়ান্ত বিজয় মনে করে গনিমতের মাল কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সুযোগে কুরাইশদের অশ্বারোহী দল পেছন থেকে আক্রমণ করে মুসলিম সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

যুদ্ধের ফলাফল

উহুদ যুদ্ধে ৭০জন মুসলিম বীর শাহাদাত বরণ করেন। আর মাত্র ২৩ জন কাফির মৃত্যুবরণ করে। নেতার আদেশ অমান্য করা এবং শৃঙ্খলাবোধের অভাবে এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় হয়। এছাড়া তৎকালীন মুশরিক নেতা খালিদ বিন ওয়ালিদের রণকৌশল মুসলমানদের বিপর্যয়ে ভূমিকা রেখেছিল।

যুদ্ধের গুরুত্ব

এ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের ধৈর্য ও ইমানের অগ্নিপরীক্ষা। সাময়িক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ ধৈর্য ও ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সাময়িকভাবে বিজয়ী হয়েও কুরাইশরা মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করতে সাহস করেনি। কোনো মুসলিমকে বন্দিও করতে পারেনি। অপরদিকে মহানবি (সা.) মুসলিম সৈন্যদের একটি দলকে

কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। এতে মুসলমানদের সাহস ও মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়। তাঁদের সাময়িক বিপর্যয় ভবিষ্যৎ বিজয়ের পথকে উন্মোচিত করে। নেতার আদেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তাঁরা সম্যকভাবে অবহিত হন। পরবর্তীকালে আর কোনো যুদ্ধে তাঁরা এ ভুল করেননি।

খন্দকের যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধের পটভূমি

মক্কার কুরাইশরা উহুদের যুদ্ধে সাময়িকভাবে জয়লাভ করলেও যেসব উদ্দেশে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, সেসবের কোনোটাই অর্জিত হয়নি। তারা মদিনায় রাসুল (সা.)- এর শক্তি, সম্মান ও মর্যাদা দুর্বল করতে পারেনি। সিরিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্য পথও নিরাপদ হয়নি। তাছাড়া কুরাইশরা ফিরে যাওয়ার পরে মদিনার মুসলমানরা আরো বেশি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। তাই কুরাইশরা তাদের ধর্মীয়, সামাজিক এবং বাণিজ্যিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ সময় মদিনা শহরতলিতে বসবাসরত বেদুঈনরা তাদের লুটতরাজ বজায় রাখার জন্য কুরাইশদের সাথে আঁতাত শুরু করে দেয়। তাছাড়া উহুদ যুদ্ধের পর বনু নাযির গোত্রকে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের জন্য মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী লোকদের উসকানি দিতে থাকে। যার ফলে আরেকটি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মক্কার কুরাইশ, মদিনার পার্শ্ববর্তী বেদুঈন এবং মদিনা থেকে বিতাড়িত ইহুদি এই তিনশক্তি একত্রিত হয়। তারা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ১০,০০০ (দশ হাজার) সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে। এই ত্রিশক্তির ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) ৩,০০০ (তিন হাজার) সৈন্য সংগ্রহ করেন। তিনি শত্রু মোকাবেলার জন্য সাহাবাদের নিয়ে পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। সালমান ফার্সির পরামর্শক্রমে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মদিনার দক্ষিণ দিক ঘন খেজুর বাগান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল আর পূর্বদিকে বনু কুরাইযার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল। তাই মদিনার উত্তর ও পশ্চিম দিক অরক্ষিত ও উন্মুক্ত থাকায় এ দু'দিকে পরিখা খনন করা হয়। প্রায় ৩০০০ মুহাজির ও আনসার কঠোর পরিশ্রম করে এক সপ্তাহে খনন কাজ সমাপ্ত করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও খনন কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

খন্দক বা পরিখা খননের মাধ্যমে কাফিরদের মোকাবেলা করা হয়েছিল বলে এ যুদ্ধকে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। এছাড়া কাফির-মুশরিকদের বিভিন্ন দল একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বলে এ যুদ্ধ আহযাবের (আহযাব অর্থ দল বা সম্প্রদায়সমূহ) যুদ্ধ নামেও পরিচিত।

যুদ্ধের ঘটনা

কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে তাঁবু স্থাপন করে। তারা মদিনা শহর রক্ষায় মহানবি (সা.) -এর অভিনব কৌশল দেখে বিস্মিত হলো। ৩১ মার্চ ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হলো। আবু সুফিয়ান ২৭ দিন মদিনা

অবেরোধ করে রাখেন। এ সময় কুরাইশবাহিনী পরিখা অতিক্রম করে হামলা চালাতে বারবার ব্যর্থ হয়। আস্তে আস্তে তাদের খাদ্য ও রসদের অভাব দেখা দেয়। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বাতাসে তাদের তাঁবুগুলো উড়ে যায়। ফলে আবু সুফিয়ান অবরোধ ত্যাগ করে মক্কার ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধের ফলাফল

মহানবি (সা.) -এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, উন্নত রণকৌশল এবং গোয়েন্দাদের সফলতার কারণে মুসলমানরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করে। অপরদিকে কাফির-মুশরিক ও ইহুদিদের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। মুসলমানদের ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং দৃঢ় মনোবলের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং খাদ্য-রসদের সংকট কাফিরদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে কাফিরদের দম্ভ শেষ হয়ে যায়। তাদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তাদের সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়। অপরদিকে মহানবি (সা.)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের ধর্ম ও বাণিজ্য প্রসারের সমস্ত বাধা দূর হয়। মদিনার পার্শ্ববর্তী ইহুদি ও বেদুঈন গোত্রের উপর মুসলমানরা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা স্বেচ্ছায় মুসলমানদের মিত্রে পরিণত হয়।

বনু কোরায়যা গোত্রের ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপট

মদিনায় হিজরতের পর দীর্ঘ ৬ বছর মুসলমানরা পবিত্র হজ পালন করতে পারেননি। প্রিয় জন্মভূমির দর্শনও লাভ করেননি। তাই খন্দক যুদ্ধে জয়লাভের পর মুহাজিরদের মন স্বদেশে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মহানবি (সা.) তাদের অন্তরের ব্যথা বুঝতে পারেন। তাই তিনি ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের জিলকদ মাসে মাতৃভূমির দর্শন ও পবিত্র ওমরাহ পালনের জন্য ১৪০০ জন সাহাবিসহ মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

যিলকদ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। তাই মহানবি (সা.) আশা করেছিলেন, এ মাসে বিধর্মীরা তাদেরকে বাঁধা দিবে না। তিনি সাহাবিদের নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা খালিদ ও ইকরামার নেতৃত্বে একটি দল পাঠিয়ে মুসলমানদের বাঁধা প্রদান করে। মহানবি (সা.) বুদাইল নামক ব্যক্তির মাধ্যমে কুরাইশদের জানালেন যে, তিনি শুধুমাত্র ওমরাহ পালন করে চলে যাবেন; এছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। মহানবি (সা.) আলোচনার জন্য উসমান (রা.)-কে তাদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু তারা আলোচনা না করে উসমান (রা.)-কে আটক করে। এদিকে হযরত উসমান (রা.) ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় মুসলমানদের মাঝে গুজব রটে যে, কুরাইশরা তাঁকে হত্যা করেছে। তাই মুসলমানরা উসমান (রা.)- এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর হাতে আমরণ সংগ্রামের বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেন। এটিই ইতিহাসে বাইয়াতুর রেদওয়ান নামে পরিচিত। আল্লাহ

তা'আলা সূরা ফাতহের ১৮ নং আয়াতে বাইয়াত গ্রহণকারীদের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

সন্ধি স্থাপন

মুসলমানদের বাইয়াতের দৃঢ়তা কুরাইশদের মনে ভীতির সঞ্চার করলো। তারা উসমান (রা.)কে ছেড়ে দিল এবং সোহাইল বিন আমরকে সন্ধি স্থাপনের জন্য রাসুল (সা.)- এর নিকট পাঠালো। আলাপ-আলোচনার পর উভয় পক্ষের সম্মতিতে সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়। এটাই ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। হুদায়বিয়ার সন্ধির উল্লেখযোগ্য শর্তসমূহ নিম্নরূপ:

১. মুসলমানগণ এ বছর হজ পালন না করে মদিনায় ফিরে যাবে।

২. আগামী বছর মুসলমানরা হজ করতে পারবে, কিন্তু তিনদিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। এ তিনদিন কুরাইশরা নগর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিবে।

৩. পরের বছর যখন তারা হজ করতে আসবে, তখন কেউই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আসতে পারবে না। তবে আত্মরক্ষার জন্য শুধুমাত্র কোষবদ্ধ তরবারি আনতে পারবে।

৪. হজের সময় মুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

৫. মক্কায় অবস্থানকারী কোনো মুসলমানকে মদিনায় নিয়ে যেতে পারবে না।

৬. যদি কোনো মুসলমান কুরাইশদের পক্ষে যোগ দেয় তাহলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদের দলে আসলে তার অভিভাবক চাইলে তাকে ফেরত দিতে হবে।

৭. আরবের যে কোনো গোত্র মহানবি (সা.) অথবা কুরাইশদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।

৮. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ১০ বছর বন্ধ থাকবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব

হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মুসলমানদের পরাজয় মনে হলেও এটা ছিল মুসলমানদের জন্য মহাবিজয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে ফাতহুম মুবিন বা প্রকাশ্য বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এ সন্ধির ফলে মুসলিম-অমুসলিমদের পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগ হয়। ফলে মুসলমানদের আন্তরিকতা, উদারতা ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে কাফির-মুশরিকরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আসের মতো বীরদ্বয় এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সন্ধির পরে এত বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করে যে, মাত্র ২ বছরের মধ্যে রাসুল (সা.) ১০,০০০ সাহাবি নিয়ে মক্কা অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

এ সন্ধির ফলে মহানবি (সা.) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বীকৃতি লাভ করেন। শান্তির দূত হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়। কুরাইশরা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা হিসেবে মেনে নেয়। এ সন্ধিতে ১০ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকার কথা ঘোষণা করা হয়, ফলে নিজ গোত্র কুরাইশদের সাথে মহানবি (সা.) -এর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। মহানবি (সা.) আপাতত কুরাইশদের শত্রুতা থেকে নিস্তার পেয়ে নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। এসময় তিনি রোম সম্রাট, পারস্য-সম্রাট, আবিসিনিয়ার নাজ্জাশি প্রমুখের কাছে দূত পাঠিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

মোটকথা, হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

প্যানেল আলোচনা

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনাদর্শ (সম্প্রীতি, সহাবস্থান, ধৈর্য, ত্যাগ) তুমি বাস্তব জীবনে কীভাবে চর্চা করবে তা দলে/প্যানেল আলোচনা করে উপস্থাপন (পোস্টার) করো।

হযরত ইবরাহিম (আ.)

পরিচিতি

হযরত সালেহ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর মানুষ এক আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিপূজা ও নক্ষত্র পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সুপথে আনার জন্য ইবরাহিম (আ.)-কে নবিরূপে প্রেরণ করেন। তিনি পশ্চিম ইরাকের বসরার নিকটবর্তী 'বাবেল' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আজর। তিনি একজন প্রসিদ্ধ নবি ও রাসুল ছিলেন। তাঁকে আবুল আম্বিয়া বা নবিগণের পিতা বলা হয়। তাঁর স্ত্রী সারার পুত্র ইসহাক (আ.)- এর বংশধর 'বনি ইসরাইল' নামে পরিচিত। অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাইল (আ.)- এর বংশে জন্ম নেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ (সা.)।

নবুওয়াত লাভ ও তাওহিদের দাওয়াত

হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সঠিক সময় জানা যায়নি। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বাল্যকাল হতেই সঠিক জ্ঞান ও হেদায়েত দান করেছিলেন। তাঁর উপর দশটি সহিফা নাযিল হয়। ইবরাহিম (আ.) দেখলেন তাঁর জাতি চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, মূর্তি ইত্যাদির পূজায় ব্যস্ত। এ পরিস্থিতিতে ইবরাহিম (আ.) তাদেরকে অত্যন্ত নম্রভাবে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা এক আল্লাহর প্রতি ইমানের দাওয়াত দিলেন। আল্লাহর সাথে শিরক করতে নিষেধ করলেন। মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বললেন। কিন্তু তারা ইবরাহিম (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর তিনি বাদশাহ নমরুদকে ইমানের দাওয়াত দিলেন। এতে নমরুদ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ইবরাহিম

(আ.)-কে আগুনে ফেলে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নমরুদের নির্দেশে ইবরাহিম (আ.)-কে হাত পা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। ইবরাহিম (আ.) তখনও আল্লাহর উপর ভরসা করলেন। আল্লাহ তা'আলা আগুনকে ইবরাহিম (আ.)-এর জন্য শীতল হওয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রজ্জ্বলিত আগুন ইবরাহিম (আ.)-এর জন্য শীতল ও পরম আরামদায়ক হয়ে গেল। তাঁর হাত-পায়ের রশিগুলো আগুনে পুড়ে গেল। মহান আল্লাহর রহমতে নিরাপদে তিনি অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে আসলেন।

হিজরত

নমরুদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মহান আল্লাহর হুকুমে হযরত ইবরাহিম (আ.) জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে দ্বীন প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি স্ত্রী সারা ও ভাতিজা হযরত লুতকে সঙ্গে নিলেন। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে সেখানে দ্বীন-ই-হানিফের প্রচার শুরু করেন। এভাবে দাওয়াত দিতে দিতে ইবরাহিম (আ.) সিরিয়া অথবা ফিলিস্তিনের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

স্ত্রী ও পুত্রকে মক্কায় নির্বাসন ও যমযম কূপের সৃষ্টি

বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহিম (আ.)-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন। তাঁর স্ত্রী হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাইল (আ.)-এর জন্ম হয়। আল্লাহর নির্দেশে তিনি হাজেরা আর ইসমাইলকে বর্তমান কাবাগৃহের নিকটবর্তী একটি গাছের নিচে রেখে আসেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে সামান্য পানি ও খেজুর রেখে আসেন।

কিছুদিন পর খেজুর ও পানি দু'টোই শেষ হয়ে গেল। তাঁর স্ত্রী হাজেরা পানি ও খাবারের জন্য সাফা-মারওয়া পাহাড়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। সাতবার ছোটাছুটির পরও কোনো খাবার ও পানি পেলেন না। অতঃপর তিনি ইসমাইলের নিকট ফিরে আসলেন। এসে দেখলেন, শিশু ইসমাইল পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছে। আর আল্লাহর কুদরতে সেখান থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। হযরত হাজেরা পানি ধরে রাখার জন্য বাঁধ দিলেন। তিনি নিজে পানি পান করলেন এবং ইসমাইলকেও পান করালেন। এটাই হলো যমযম কূপের উৎস।

ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানি

ইসমাইল (আ.)-যখন ১৩ বা ১৪ বছরের বালক, তখন হযরত ইবরাহিম (আ.) একাধারে তিনরাত স্বপ্নে পুত্র ইসমাইলকে কুরবানির জন্য আদিষ্ট হলেন। এ স্বপ্নের পর ইবরাহিম তাঁর পুত্রকে বললেন, 'হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি কুরবানি করছি। এখন তোমার অভিমত কী?' ইসমাইল বললেন, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তাই করুন।' পুত্রের সম্মতি পেয়ে ইবরাহিম (আ.) মিনা প্রান্তরে যান। সেখানে প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করতে শুরু করলেন।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ইসমাইল (আ.)-এর স্থলে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায়ও তিনি সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন।

কাবাঘর পুনর্নির্মাণ

ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সর্বপ্রথম কাবাঘর নির্মাণ করেন। নূহ (আ.)-এর সময় প্লাবনে কাবার কাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মহান আল্লাহ ইবরাহিম (আ.)-কে কাবাঘর পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন। ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) মিলে বায়তুল্লাহ তৈরির কাজ শুরু করেন। ইসমাইল (আ.) পাথর এনে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এভাবে পবিত্র কাবাঘরের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হয়।

গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য

ধৈর্য, সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ইবরাহিম (আ.)- এর অন্যতম চারিত্রিক গুণাবলি। আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, বিপদে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, প্রতিকূল অবস্থায় ইমানের ওপর টিকে থাকা, হেকমতের সাথে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন তিনি। হযরত ইবরাহিম (আ.) মেহমানদারিতে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর খুবই প্রিয়ভাজন খলিল বা বন্ধু ছিলেন।

ইন্তেকাল

হযরত ইবরাহিম (আ.) ১৭৫ মতান্তরে ১৯৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে কানআনে অবস্থিত হেবরন নামক গ্রামে দাফন করা হয়। গ্রামটি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ১০/১২ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে উক্ত স্থানের নামকরণ করা হয়েছে মদিনাতুল খলিল।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

হযরত ইবরাহিম (আ.) এর জীবনাদর্শের কোন কোন দিকগুলোতে ত্যাগের মহিমা ফুটে উঠেছে বলে তুমি মনে করো?

পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা/মতবিনিময়ের মাধ্যমে লিখে আনবে।

আমার পরিবারের সদস্য	হযরত ইবরাহিম (আ.) এর ত্যাগ সম্পর্কে মতামত
বাবা	আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে হিজরত করেন।
মা	
ভাই	
বোন	

হযরত উসমান (রা.)

জন্ম ও পরিচয়

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে ৫৭৩ মতান্তরে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আমর এবং আবদুল্লাহ। তাঁর উপাধি 'যুননুরাইন' ও 'জামেউল কুরআন'। তাঁর পিতার নাম আফফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ। উসমান (রা.) বড় ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। এজন্য তিনি 'উসমান গনি' নামে পরিচিত ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত উসমান (রা.)- এর বয়স যখন ৩৪ বছর তখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) আবির্ভূত হন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)- এর দাওয়াতে তাঁর মন ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তিনি রাসুল (সা.)- এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিবাহ

তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর দুই কন্যা রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। প্রথমে রাসুল (সা.) তাঁর কন্যা রুকাইয়াকে হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট বিয়ে দেন। রুকাইয়া মারা গেলে হযরত উসমান (রা.) হযরত উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। এ কারণে তাঁকে উপাধি দেওয়া হয় 'যুননুরাইন' বা দুই জ্যোতির অধিকারী। রাসুল (সা.) তাঁকে এত পছন্দ করতেন যে, উম্মে কুলসুমের ইন্তেকালের পর বলেছিলেন, 'যদি আমার আরও কন্যা থাকত, তাকেও আমি হযরত উসমান (রা.)- এর কাছে বিয়ে দিতাম। রাসুল (সা.) আরো বলেন, বেহেশতে প্রত্যেক নবিরই একজন বন্ধু থাকবে, আর আমার বন্ধু হবে হযরত উসমান (রা.)।

প্রথম হিজরতকারী

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উসমান (রা.)-কে তাঁর চাচা হাকাম নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগল। যখন শাস্তির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল, রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াকে নিয়ে অন্যান্য সাহাবিসহ আবিসিনিয়ায় বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। সেখানে দুই বছর থাকার পর মক্কায় ফিরে এসে তিনি মদিনায় হিজরত করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে মিলিত হন।

কূপ ক্রয় ও মসজিদ সম্প্রসারণ

মুহাজিরগণ যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন সেখানে বিশুদ্ধ পানির খুবই অভাব ছিল। মদিনায় এক ইহুদির মালিকানাধীন 'বীরে রুমা' নামক একটি কূপ ছিল। ইহুদি এ কূপের পানি চড়া দামে বিক্রি করত। মুহাজিরগণের পানি ক্রয় করে পান করার সামর্থ্য ছিল না। মুসলমানরা মহানবি (সা.)- এর কাছে এসে পানির সংকটের কথা জানালেন। মহানবি (সা.) ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি আছে যে এই কূপটি কিনে মুসলমানদের

জন্য ওয়াকফ করে দিবে? এটা যে করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে একটি ঝরনা দান করবেন।' তখনই হযরত উসমান (রা.) কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

এছাড়াও হযরত উসমান (রা.) মসজিদে নববির পাশের জায়গা উচ্চমূল্যে ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দান করেন।

ইসলামের সেবা

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন প্রথম ওহি লেখক। তিনি নিজের ধন-সম্পদের সর্বস্ব দিয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাবুক অভিযানের ব্যয় বহনের জন্য তিনি নগদ ১০০০ দিনার, ১০০০টি উট, ৭০টি ঘোড়া এবং সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার বহন করেন। শুধু বদরের যুদ্ধে স্ত্রী অসুস্থ থাকার কারণে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কুরাইশদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে গিয়েছিলেন।

খলিফা হিসেবে দায়িত্বলাভ

হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ৬ সদস্যের নির্বাচনী পরিষদ গঠন করেন। তাঁদের মধ্যে এ পরিষদের ৬জন ছিলেন হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত জোবায়ের (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত আবদুর রহমান (রা.)। হযরত আবদুর রহমান (রা.) স্বীয় দাবি প্রত্যাহারপূর্বক ভোটদানে বিরত থেকে রাত জেগে নির্বাচনী পরিষদের প্রতিটি সদস্যের গৃহে গমন করেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেন। অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত উসমান (রা.) খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন।

কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রা.)- এর অসামান্য কৃতিত্ব হলো কুরআন মাজিদ সংকলন। হযরত ওমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)- এর সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কুরআন মাজিদ পাঠ ও উচ্চারণে অসঙ্গতি নিরসনে যায়েদ বিন সাবিত (রা.)- এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি হযরত হাফসা (রা.)- এর নিকট সংরক্ষিত কুরআন মাজিদের পাণ্ডুলিপি থেকে অনুরূপ আরো ৬টি কপি সংকলন করেন। ৪টি কপি বসরা, কুফা, দামেস্ক ও মক্কায় প্রেরণ করেন এবং বাকি ২টি কপি মদিনায় রাখেন। এভাবে তিনি পবিত্র কুরআন সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত উসমান (রা.) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি রাসুল (সা.)- এর জামাতা ও ফুফাতো ভাই ছিলেন। তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী, দানশীল ও পুণ্যবান ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সর্বদা তাঁর চক্ষু সজল থাকত। মহানবি (সা.) যখন কবরের আলোচনা করতেন, তখন তাঁর চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যেত। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করতেন, 'আপনি জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা শুনলেও এত কাঁদেন না। অথচ কবরের আলোচনায় এত কাঁদেন কেন?' তখন তিনি বলতেন, 'কবর হলো পরকালের প্রথম ধাপ, যদি এখানে

আমি বিপদগ্রস্ত হই, তবে পরবর্তী সকল ধাপে বিপদগ্রস্ত হব।'
তিনি অত্যন্ত দানশীল ও জনসেবক ছিলেন। তাঁর সময়ে তাঁর অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক রাস্তা, সেতু, মসজিদ, বাসগৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।

ইন্তেকাল: হযরত উসমান (রা.) ১২ বছর খিলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে ৮২ বছর বয়সে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে শাহাদতবরণ করেন।

একক কাজ
'হযরত ওসমান (রা.) এর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুমি যে যে কাজ বাস্তব জীবনে চর্চা/অনুশীলন করবে'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তুমি শ্রেণিতে নির্ধারিত ছকটি পূরণ করো।)

ক্রমিক	গুণাবলী	যেভাবে চর্চা/অনুশীলন করব
১.	পরোপকারী	বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করব।
২.		
৩.		
৪.		

হযরত ফাতিমা (রা.)

পরিচয়

হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন মহানবি (সা.)-এর আদরের কনিষ্ঠা কন্যা। হযরত আলী (রা.)-এর স্ত্রী। তাঁর উপাধি ছিল যাহরা। তাঁর মাতা ছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)। তিনি ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর শারীরিক অবয়ব, কথা বার্তা, স্বভাব প্রকৃতি ও চলাফেরার ধরন ছিল অবিকল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মত। এই মহীয়সী নারীর যাপিত জীবন সকল মুসলিম নারীর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি জান্নাতি নারীগণের নেত্রী হবেন।

হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ

মহানবি (সা.) দ্বিতীয় হিজরিতে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ফাতিমার বিবাহ দেন। হযরত আলী (রা.) বদর যুদ্ধ প্রাপ্ত লৌহ বর্ম উসমান (রা.)-এর নিকট ৪৮০দিরহামে বিক্রি করেন। বিক্রিত অর্থ দিয়ে বিবাহের মহর ও অন্যান্য খরচ সমাধা করেন। হযরত আলী (রা.)-এর তেমন কোনো আসবাবপত্র ছিলো না। এমন কি কোনো দাস-দাসীও ছিলো না। তাই ফাতিমা (রা.)-কেই ঘরের সব কাজ করতে হতো। যাঁতাকল ঘুরাতে ঘুরাতে তাঁর

হাতে ফোসকা পড়ে যায়। মশক ভর্তি পানি টানতে টানতে তাঁর কোমরে দাগ হয়ে যায়। আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.) এর এই বরকতময় সংসারে মোট পাঁচজন সন্তান জন্ম লাভ করেন। তাঁরা হলেন, যয়নব, হাসান, হুসাইন, মুহসিন ও উম্মে কুলসুম।

হাদিস শাস্ত্রে অবদান

হযরত ফাতিমা (রা.) সর্বমোট ১৮টি হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন, হযরত আলী, হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত আয়েশা, হযরত উম্মে কুলসুম, হযরত সালমা, হযরত উম্মে রাফে, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) প্রমুখ সাহাবির নাম উল্লেখযোগ্য।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন একজন আদর্শ জননী; একজন আদর্শ স্ত্রী; একজন আদর্শ সমাজ-সেবিকা; একজন সত্যবাদী ও পুণ্যবতী নারী। রাত জেগে তিনি ইবাদাত করতেন। প্রায়ই রোযা রাখতেন।

দানশীলতা

হযরত ফাতিমা (রা.) গরিব-দুঃখীকে অতিমাত্রায় দান-খয়রাত করতেন। একদিন একজন আরব বৃদ্ধ মুহাজির রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আসেন। ঐ বৃদ্ধ লোকটি বলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে খাদ্যদান করুন। আমার পরনে কাপড় নেই, আমাকে পরিধেয় বস্ত্রদান করুন। আমি নিঃস্ব, দরিদ্র, আমাকে দয়া করে কিছু দিন।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'আমার কাছে এখন দেওয়ার মতো কিছু নেই। তুমি ফাতিমার বাড়িতে যাও। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলও তাকে ভালোবাসে। সে আল্লাহর পথে দান করে থাকে।' বৃদ্ধ লোকটি ফাতিমা (রা.) -এর বাড়িতে গেলেন। ফাতিমা (রা.)- এর কাছে তার প্রয়োজনের কথা খুলে বললেন। অথচ হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত আলী (রা.) ও রাসুল (সা.) তিনদিন যাবত কিছু খাননি। হযরত ফাতিমা দুম্বার চামড়া বিশিষ্ট হাসান ও হুসাইনের বিছানাটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'হে দরজার বাহিরে দণ্ডায়মান ব্যক্তি! এটা নিয়ে যাও। আশা করি আল্লাহ তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন'।

আরব বৃদ্ধটি বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর কন্যা! আপনার কাছে আমি ক্ষুধা নিবারণের কথা বলেছি আর আপনি আমাকে পশুর চামড়া দিচ্ছেন। আমি এ চামড়া দিয়ে কী করবো? হযরত ফাতিমা বৃদ্ধ লোকটির কথা শুনে তাঁর গলার হারটি খুলে তাকে দান করে দিলেন। আর বললেন, 'এটাকে নিয়ে বিক্রি কর। আশা করি আল্লাহ তোমাকে এর চেয়ে আরো উত্তম কিছু দান করবেন'। এভাবে তিনি তাঁর প্রিয় বস্তু দানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে অনুসরণীয় হয়ে রইলেন।

বদান্যতা

একবার হযরত ফাতিমা (রা.) হস্তচালিত যাঁতাকল দিয়ে আটা তৈরি করছিলেন। যাঁতাকলের হাতল ঘুরাতে গিয়ে ফাতিমা (রা.)-এর হাতের ক্ষতস্থান হতে রক্ত বের হচ্ছিল। তখন শিশু হুসাইন তাঁর পাশে বসে ক্ষুধায় কাঁদছিলেন। একজন সাহাবি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসুলের কন্যা! আপনার হাতে ক্ষত হয়ে গেছে। 'ফিদ্দা' (ফাতিমার গৃহপরিচারিকার নাম) তো আপনার ঘরেই আছে।' তখন ফাতিমা বললেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে আদেশ করেছেন যে, পালাক্রমে একদিন ফিদ্দা ঘরের কাজ করবে। আর আমি অন্য একদিন। তার পালা গতকাল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার পালা।'

ইন্তেকাল

মহানবি (সা.) ইন্তেকালের ছয়মাস পর হিজরি ১১ সালের রমযান মাসে হযরত ফাতিমা ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসিয়ত অনুসারে জানাযা দিয়ে তাঁকে রাতে দাফন করা হয়।

হযরত শাহ জালাল (রহ.)

হযরত শাহ জালাল (রহ.) ছিলেন একজন কামেল ওলি। তিনি একজন হিদায়েতের পথ প্রদর্শক, আধ্যাত্মিক সাধক এবং ইসলাম প্রচারক ছিলেন।

জন্ম ও পরিচয়

হযরত শাহ জালাল (রহ.) ৬৭১ হিজরি মোতাবেক ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানেই প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতার নাম মাহমুদ। শাহ জালাল তিন মাস বয়সে মাতাকে হারান। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতাও মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মামা আহমদ কবির তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ।

শৈশবকাল

হযরত শাহ জালাল (রহ.) তাঁর মামা ও শিক্ষাগুরু আহমদ কবিরের নিকট কুরআন-হাদিসসহ ইসলামের মৌলিক বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে শাহ জালালকে তাঁর মামা ইয়েমেন থেকে মক্কায় নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে শরিয়ত ও মারেফত (তাসাউফ)- এর শিক্ষা দান করেন। এছাড়াও তৎকালীন আলেমদের থেকে তিনি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দ্বীনি বিষয়াদি শিক্ষা লাভ করেন। তাতে তিনি ইসলামের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন।

ইসলাম প্রচার

হযরত শাহ জালাল (রহ.) আল্লাহর দ্বীনের প্রচারক ছিলেন। তিনি ৭০৩ হিজরি মোতাবেক ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশ ত্যাগ করে ভারতীয় উপমহাদেশে হিজরত করেন। সিলেটের প্রথম মুসলমান শেখ বোরহান উদ্দিন (রহ.)-এর উপর রাজা গৌরগোবিন্দ অবর্ণনীয় অত্যাচার করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত শাহজালাল (র.) ৩৬০ আউলিয়াসহ সিলেটে আগমন করেন। একপর্যায়ে তাঁর সাথে জালিম রাজা গৌরগোবিন্দের এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আল্লাহর রহমতে হযরত শাহ জালাল (রহ.) ও তাঁর অনুসারীরা জালিম রাজাকে পরাজিত করেন। তাঁর মামা মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ কবীর (র.) তাঁকে এক মুঠো মাটি দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, ‘স্বাদে বর্ণে গন্ধে এই মাটির মতো মাটি যেখানে পাবে, সেখানে বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করবে।’ সিলেটের মাটির সাথে আরবের মাটির মিল পাওয়া যায়। তাই হযরত শাহজালাল (র.) সিলেটে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। তিনিই সর্বপ্রথম সিলেট এলাকায় উচ্চস্বরে আযান দেওয়ার প্রচলন করেন। অতঃপর তিনি ইসলাম প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করেন। সিলেট অঞ্চলে তার মাধ্যমেই ইসলামের প্রসার ঘটে। তিনি আদর্শজীবনের অধিকারী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতেন। তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক মাধুর্য ও অলৌকিকত্বে মুগ্ধ হয়ে অনেক মানুষ তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর হাতে এ দেশের

অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন'। তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে যে অবদান রেখে গেছেন তার তুলনা উপমহাদেশে বিরল।

কারামত

শাহ জালাল (রহ.)-এর জীবন অসংখ্য কারামতে পরিপূর্ণ। তিনি জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ৩৬০ জন সঙ্গীসহ সুরমা ও বরাক নদী পার হয়ে গিয়েছিলেন। ইবন বতুতাও তাঁর সফরনামায় শাহ জালাল (রহ.)-এর বেশ কিছু কারামত উল্লেখ করেছেন। যেমন ইবন বতুতা যখন তাঁর সাথে দেখা করতে সিলেট আসলেন, পথিমধ্যে দেখতে পেলেন, শাহ জালাল (রহ.) তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাঁর মুরিদদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অথচ ইবন বতুতা তাঁকে আগে খবর পাঠিয়ে আসেননি।

ইন্তেকাল

হযরত শাহজালাল (রহ.) দীর্ঘ ২৩ বছর ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত থেকে ৭৪০হি./১৩৪১ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।

হযরত শাহ জালাল (রহ.) ইবাদত ও আধাত্মিক সাধনার এক বিস্ময়কর প্রতীক ছিলেন। তিনি নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত সারা বছর রোযা রাখতেন এবং রাতে ইবাদত করতেন। কাল পরিক্রমায় তিনি নিষ্ঠাবান দাঈদের জন্য আদর্শে পরিণত হলেন।

দলীয়/প্যানেল আলোচনা

হযরত ফাতিমা (রা.) এবং হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনাদর্শ তুমি বাস্তব জীবনে কীভাবে চর্চা করবে, তা দলে/প্যানেল আলোচনা করে উপস্থাপন (পোস্টার) করো।